সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন
বিদ্যমান পরিস্থিতি ও করণীয়

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল - বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৭১৬৯৮৩০, ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৭৭২
ই-মেইল : mail@spb.org.bd
ওয়েবসাইট : www.spb.org.bd

মূল্য : বিশ টাকা

ভূমিকা

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া এবং তার মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার মদদপুষ্ট মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবী অর্থনীতিবিদরা সমস্বরে সোরগোল তোলে এই বলে যে, সমাজতন্ত্র তথা মার্কসবাদ অকার্যকর হয়ে গেছে। এ প্রচারণায় সারা দুনিয়ার মতো আমাদের দেশেও কিছু বামপন্থি দল ও বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংকট সমাধানের মুসাবিদা হিসাবে সামনে আনা হয় তথাকথিত নয়া বিশ্বব্যবস্থার (New world order) বিধান।

মুক্তবাজার অর্থনীতি, নয়া উদারীকরণ ইত্যাদির ছদ্মাবরণে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে এই পুস্তিকাটি বামপন্থি নেতা-কর্মী-সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীসহ সর্ব মহলে ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা করি। আমরা সর্বমহলের মতামত ও সমালোচনা প্রত্যাশা করি যাতে আমাদের দলের ব্যাখ্যা-ভাবনা ও সিদ্ধান্তকে আরও উন্নত এবং কার্যকর করতে পারি।

ধন্যবাদসহ
খালেকুজ্জামান
আহ্বায়ক
বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন
বিদ্যমান পরিস্থিতি ও করণীয়

সাম্প্রতিককালে, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙনের পর, দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম আদর্শগত ও সাংগঠনিক উভয় দিক থেকেই দুর্বল হয়েছে। সেই সুযোগে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ একতরফা আধিপত্য চালাচ্ছে, যা দেখে সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ, এমনকি মার্কসবাদে বিশ্বাসীদেরও একটি অংশ বিভ্রান্ত। তাঁদের অনেকেই বলছেন, মার্কস যে বলেছিলেন পুঁজিবাদ বিকশিত হতে হতে ক্রান্তি বিন্দুতে পৌঁছে ভেঙে পড়বে – তা তো ঘটেইনি, বরং দেখা যাচ্ছে মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের আয়ুষ্কাল বেড়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা দেখে তাঁরা ভাবছেন, তাহলে হয়ত পুঁজিবাদের একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যা দিয়ে সে বারবার সংকট কাটিয়ে উঠছে। এখানেই শেষ নয়, ইদানিংকালে "বাজার অর্থনীতি" ও পুঁজিবাদী "বিশ্বায়নের" প্রক্রিয়া, যা আসলে বর্তমান যুগে একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদেরই সংকটের প্রকাশ, তার কিছু বৈশিষ্ট্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা খাড়া করে একদল বলছেন – দেড়শো বছর আগে পুঁজিবাদের যে নরখাদক চেহারা মার্কস দেখিয়েছেন, সত্তর আশি বছর আগে সাম্রাজ্যবাদের যে অমানবিক পরদেশগ্রাসী চেহারা লেনিন দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বর্তমানে আর সে-রকম নেই। তথাকথিত প্রযুক্তিবিপ্লব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অকল্পনীয় উন্নয়ন বিশ্বকে শুধু হাতের মুঠোতেই আনেনি – অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবদিক থেকে বিশ্বকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছে যে, এককভাবে কোনো দেশ আজ আর এগোতে পারে না। তাদের ভাষ্য, বিশ্বায়ন দেশের সীমানা মুছে দিয়েছে; উপনিবেশবাদকে ইতিহাসের বিষয় করেছে; মার্কসের যুগের দুনিয়া আর নেই; তাই শ্রেণীসংগ্রাম, বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। এমনকি মার্কসবাদী বলে পরিচিতদের মধ্যেও অনেকেই মনে করছেন মার্কসবাদকে পুরনো ধারণা থেকে মুক্ত করতে হবে।

বিচার করলে দেখা যাবে এসব বিভ্রান্তি তাঁদেরই ঘটছে যাঁরা মুখে মার্কসবাদের কথা বললেও, মার্কসবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তুকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি; না হলে তাঁরা বুঝতে পারতেন, পুঁজিবাদ বিকশিত হতে হতে শেষ পর্যায়ে পৌঁছালে বিপ্লবের বাস্তব জমি (objective condition) তৈরি হয় কিন্তু আপনা-আপনি বিপ্লব ঘটে যায় না। মার্কস-এঙ্গেলসই বলেছেন – তাঁদের তত্ত্ব অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ নয়। আদর্শ, চেতনা, ভাবধারার যথাযোগ্য ভূমিকাকে তাঁরা অস্বীকার করেননি। মার্কসবাদ দেখায় সঠিক সর্বহারাশ্রেণীর দলের নেতৃত্বে বিপ্লবের ভাবগত প্রস্তুতি, আদর্শগত প্রস্তুতি এবং তার ভিত্তিতে উপযুক্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে না উঠলে, কেবল বাস্তব জমি তৈরি হলেই বিপ্লব ঘটে না। এই শিক্ষার আলোকে বোঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ তার অন্তর্নিহিত কোনো শক্তির জোরে টিকে নেই; তীব্র সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদ সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, একথাও সত্য নয়। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন হওয়া এবং প্রতিবিপ্লবী ও সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদের মহত্ত্বকে কালিমালিপ্ত করে শ্রমিকশ্রেণীকে আদর্শগতভাবে নিরস্ত্র করে দেওয়ায় বিপ্লবের ভাবগত ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি মার খেয়েছে, সেই কারণেই বিপ্লবের আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে পুঁজিবাদ টিকে রয়েছে। আর মার্কসবাদকে পুরনো ধারণা থেকে মুক্ত করার কথা যারা ভাবছেন তারা জেনে হোক, না জেনে হোক বাস্তবে মার্কসবাদের মূল ভিত্তি শ্রেণীসংগ্রামকে বাতিল করে বিপ্লববিরোধী শ্রেণীসমন্বয় ও আপসের কথাই বলছেন। তাই আজকে প্রকৃত মার্কসবাদীদের দায়িত্ব হল পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি চলমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের শ্রেণীচরিত্রটিও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদেরই চূড়ান্ত পরিণতি

বিকাশের পথে পুঁজিবাদই যে সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে, লেনিন খুব পরিষ্কারভাবেই তা দেখিয়েছেন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থে। সেখানে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি এও দেখান যে, মার্কসই দেখিয়েছেন ক্রমাগত পুঁজির কেন্দ্রীভবন ঘটা এবং একচেটিয়াকরণ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য পরিণাম। লেনিন বলেন – "Half a century ago, when Marx was writing capital, free competition appeared to the overwhelming majority of economists to be a "natural law". Official science tried, by conspiracy of silence, to kill the works of Marx, who by a theoretical and historical analysis of capitalism

had proved free competition gives rise to the concentration of production, which, in turn, at a certain stage of development, leads to monopoly. Today, monopoly has become a fact. Economists are writing mountains of books in which they describe, the diverse manifestations of monopoly, and continue to declare in chorus that "Marxism is refuted". (প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে মার্কস যখন ক্যাপিটাল রচনা করছিলেন তখন অধিকাংশ অর্থনীতিবিদের সামনে অবাধ প্রতিযোগিতার বিষয়টি একটি 'স্বাভাবিক নিয়ম' হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু মার্কস পুঁজিবাদের তত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে এই অবাধ প্রতিযোগিতাই উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনের জন্ম দেবে যা সময়ের সাথে সাথে বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পুঁজির একচেটিয়া চেহারায় আবির্ভূত হবে। তখন শাসকদের কর্তৃত্বাধীন বিজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলক নিরবতার মাধ্যমে মার্কসের ওই আবিষ্কারকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আজকে পুঁজির একচেটিয়া চরিত্র বাস্তব সত্য। এখন অর্থনীতিবিদরা পুঁজির একচেটিয়া চরিত্রের নানা রূপ তুলে ধরে কিতাবের পাহাড় গড়ে তুলেছেন, কিন্তু এর পাশাপাশি এ কথাটাও সমস্বরে প্রচার করে চলেছেন যে 'মার্কসবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে'।) বর্তমানেও ঠিক তা-ই ঘটছে।

সাম্রাজ্যবাদের সংকটই বিশ্বায়ন ডেকে এনেছে

প্রথমেই একটি বিষয় লক্ষ করা দরকার; তাহল, ১৯৯১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লব ঘটা এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর, সাম্রাজ্যবাদ তথাকথিত উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের পথ নিয়েছে – এই বহুলপ্রচারিত ধারণাটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। সত্তরের দশকেই বিশ্বপুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবির যে গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে তা কাটানোর উদ্দেশ্যে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান কাগজে কলমে শিল্পবাণিজ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সঙ্কুচিত এবং বেসরকারি পুঁজির প্রবেশক্ষেত্রকে প্রসারিত করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা-ই বাস্তবে নয়া উদারনৈতিক পদক্ষেপের সূত্রপাত ঘটায়। এই নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের পেছনে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদের তীব্র সংকট থেকে পুঁজিবাদকে বাঁচাবার মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। পরবর্তী সময়ে এ ব্যর্থতা যেমন প্রকট হয়েছে, তেমনি নয়া-উদারনীতিকে আরও বেশি মালিকস্বার্থ-ঘেঁষা এবং আরও বেশি জনস্বার্থবিরোধী করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তা অর্থনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি ও সংস্কৃতি – সমস্ত ক্ষেত্রকে গ্রাস করে আধুনিক বিশ্বায়নের রূপ নিয়েছে। সত্তরের দশকে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও ১৯৯৮ সালে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক বাতাবরণের সুযোগে "ওয়াশিংটন ঐকমত্য" বলে পরিচিত সিদ্ধান্তগুলি নয়া-উদারনীতির প্রয়োগকে প্রসারিত ও ত্বরান্বিত করে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আওতায় আনীত ওই নয়া-উদারনৈতিক পদক্ষেপের মূল কথা হল :

১। অর্থনীতি থেকে এবং বিশেষত সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারি ভূমিকা ক্রমশ গুটিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির লুণ্ঠন নিয়ন্ত্রণ, আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ, ক্ষুদ্র শিল্পে ও কৃষিতে সহায়তা, শিক্ষা-চিকিৎসা-খাদ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি নজরদারি ও ব্যয় কমাতে হবে।

২। কৃষি-শিল্প-পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি থেকে সরকারি উদ্যোগ গুটিয়ে নিয়ে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে হবে।

৩। পণ্য এবং পুঁজির চলাচল অবাধ করে শেয়ারবাজার থেকে শুরু করে শিল্প, কৃষি, ব্যাংক, ইনসিওরেন্স প্রভৃতি পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে বিদেশি পুঁজির আসা এবং চলে যাওয়ার পথ অবাধ ও মসৃণ করতে হবে।

উপরোক্ত কাজগুলি করার জন্য সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কাজ, যেমন বিদেশি মুদ্রার বিনিময়মূল্যের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ রদ করা; চলতি খাতে (বিদেশ ভ্রমণ, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি) এবং মূলধনী খাতে (শেয়ারে, শিল্পে বা ঘরবাড়ি নির্মাণে বিনিয়োগ এবং বিদেশি ঋণ) দেশিয় মুদ্রাকে অবাধে ও সীমাহীন পরিমাণে, অর্থাৎ যত খুশি স্থানীয় মুদ্রাকে ডলার, ইউরো ইত্যাদিতে বদল করার ব্যবস্থা করা; বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক-ইন পিরিয়ড (বাধ্যতামূলক স্থিতিকাল) না রাখা প্রভৃতি কাজগুলি করতে হবে। এককথায় বিদেশি বৃহৎ পুঁজির হানাদারি রুখতে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জাতীয় পুঁজির স্বার্থে যে বাধাগুলি দীর্ঘদিন রাখা আছে, সেগুলি তুলে নিতে হবে।

অনেকেই বলছেন – বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু অতীতের মতো নেই, তাই পশ্চাদপদ দেশগুলির নিজস্ব স্বার্থে বাধার প্রাচীর রাখারও আর প্রয়োজন নেই। বরং বিশ্বায়নের ফলে তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত হবে।

এখন প্রশ্ন হল, বিশ্বায়নের যুগে সাম্রাজ্যবাদ কি এমন কোনো নতুন চরিত্র নিয়েছে যা লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদ থেকে আলাদা? ১৯১৬ সালে লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন, যা সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের পূর্ববর্তী স্তর অর্থাৎ অবাধ প্রতিযোগিতা ও বাজারের আপেক্ষিক ক্রমসম্প্রসারণের যুগ থেকে আলাদা করে। লেনিন বলেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে –

১। উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন এমন একটা উচ্চ স্তরে পৌঁছায় যা একচেটিয়ার জন্ম দেয় এবং একচেটিয়া পুঁজি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করে।

২। ব্যাংক পুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে লগ্নীপুঁজির জন্ম হয়, যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ধনকুবের গোষ্ঠী।

৩। পণ্য-রপ্তানির থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পুঁজি-রপ্তানি অতিমাত্রায় গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেয়।

৪। একচেটিয়া গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে, যারা বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।

৫। বৃহৎ পুঁজিগোষ্ঠীগুলি গোটা দুনিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে দখল করে।

এই পুস্তিকাতেই লেনিন পুঁজিবাদের বিকাশের স্তরগুলি ভেঙে ভেঙে দেখান যে –

(১) ১৮৬০-৭০ সালে অবাধ প্রতিযোগিতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় এবং একচেটিয়া পুঁজি ভ্রূণাকারে জন্ম নেয়।

(২) ১৮৭৩-এর পুঁজিবাদের সঙ্কটের পর, দীর্ঘ সময় ধরে একচেটিয়া জোট (কার্টেল) গড়ে উঠলেও তা ছিল খুবই নগণ্য। সেগুলির স্থায়িত্ব ছিল না এবং ভাঙাগড়ার পর্যায় চলছিল।

(৩) উনিশ শতকের শেষদিকের তেজিভাব শেষ হওয়ার পর ১৯০০-১৯০৩ এর তীব্র মন্দার সময়েই একচেটিয়া জোটগুলি গোটা অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশ করে।

অর্থাৎ, পুঁজিবাদের সংকটই পুঁজিবাদকে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে ঠেলে দেয় – লেনিনের বিশ্লেষণ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে। পুঁজিবাদ কেন অনিবার্যভাবে বাজার সঙ্কটে পড়ে, ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কস তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১৮২৫ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত পুঁজিবাদ গড়ে দশ বছর অন্তর সঙ্কটে পড়েছে আবার তা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ১৮৮৬ সালে মার্কসের ক্যাপিটাল গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় ব্রিটেন সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন, "ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেই কারণে বাজারবৃদ্ধি ছাড়া শিল্পকারখানা সচল রাখা সম্ভব নয়। তাই শিল্পকারখানা পুরোপুরি স্তব্ধ। অবাধ বাণিজ্যের বিকাশ শেষ।" এই সংকটই বিংশ শতকের শুরুতে পুঁজিবাদকে সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অল্পকালের জন্য তেজিভাব দেখা দিতে না দিতেই ১৯২১ সালে আবার সংকট নেমে আসে যা শেষপর্যন্ত ১৯২৯ সালে ভয়ঙ্কর মহামন্দায় রূপ নেয়। বাজারের অভাবে উৎপাদন মার খায়, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, কোটি কোটি বেকারের দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে আসে। ১৯০০-১৯২০ সাল পর্যন্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ায় গড়ে বেকারত্বের হার ছিল ৪.৫ শতাংশ, ১৯২১ সালে তা ১৬.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। পরবর্তী বছরগুলিতে এই হার কখনো ১০ শতাংশের নিচে নামেনি। সে সময়ের সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি ইংল্যান্ডের জিনিসপত্রের দাম ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯২০ সালে সাড়ে তিনগুণ বেড়ে যায়। বাজারের অভাবে বিপুল পুঁজি অলস হয়ে পড়ে। (তথ্যসূত্র : পলিটিক্যাল ইকনমি, জন ইটন) তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদের তখনও পর্যন্ত একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়াও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র ও চীন-সহ নানা দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় এবং ভারত-সহ নানা উপনিবেশ হাতছাড়া হওয়ায় বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবিরের বাজার অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির পর্যায়ক্রমিক সংকট স্থায়ী সংকটে পরিণত হয়। বিশ্বঅর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে 'ইকনমিক প্রব্লেমস অব সোস্যালিজম ইন দি ইউএসএসআর' পুস্তিকায় ১৯৫২ সালে স্ট্যালিন দেখান – সাধারণ সঙ্কটের মধ্যেও পুঁজিবাদের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব আছে, এবং অবক্ষয় সত্ত্বেও পুঁজিবাদ আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে – এই মর্মে লেনিনের ১৯১৬ সালের সিদ্ধান্ত, এই দুটোই যুদ্ধ পরবর্তীকালে (১৯৫২) আর কার্যকর নেই।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির সামরিকীকরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দেখা যায়, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সংকট থেকে রেহাই পেতে বিপুল সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে এবং রাষ্ট্রের উদ্যোগে কৃত্রিমভাবে বাজারের চাহিদা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কৃত্রিমভাবে বাজার তৈরির রাষ্ট্রীয় চেষ্টা নতুন নয়। ১৯২৯ সালের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার মহামন্দার পরিপ্রেক্ষিতে জর্জ মেনার্ড কেইনস যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হাজির করেন তার মর্মার্থ ছিল – বাজারের চাহিদা সৃষ্টির কাজটা পুরোপুরি বাজারের নিয়মের ওপর ছেড়ে দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করে বাজারে কার্যকরী চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য সরকারি ব্যয় বাড়াতে হবে, প্রয়োজনে বাজেট ঘাটতি করেও।

এর দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণী এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচাবার জন্য সরকারি তহবিলের টাকা সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় করার দ্বারা তারা একদিকে বাজারের চাহিদা বাড়ায়, যার ফলে কিছুটা কর্মসংস্থান বাড়ে; অন্যদিকে তারা দেখায় জনগণের কল্যাণ শুধু সমাজতন্ত্রই করে না, পুঁজিবাদও করে। কেইনসীয় তত্ত্ব প্রয়োগের এই দিকটি বিচার করার সময় তৎকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২১ থেকে '২৯-এর মহামন্দায় গোটা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়া যখন হাঁসফাঁস করছে, তেমন সময়েই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে মন্দার আঁচ লাগেনি শুধু নয়, লেনিন এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েটের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছিল। এমন অবস্থায়, কেইনসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধি করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দু'ধরনের সংকটই সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। সাথে সাথে বুর্জোয়াব্যবস্থার একটা জনকল্যাণকামী চরিত্র প্রমাণেরও চেষ্টা চালায়। কিন্তু দাঁড়কাককে ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে সাজানোর এই চেষ্টা অচিরেই ব্যর্থ হয়। কারণ শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনগণের জন্য যা করতে পারে, মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। কয়েক বছরের মধ্যেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি বাজার দখলের মরিয়া চেষ্টায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বুর্জোয়ারা নিজেদের মধ্যে উপনিবেশ ভাগাভাগির দ্বন্দ্বের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাদের সকলের সাধারণ শত্রু সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এই চেষ্টায় ব্রিটেন-আমেরিকা-ফ্রান্স শুরুতে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে হিটলারের পাশে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ স্বার্থের দ্বন্দ্বে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে এবং তাকে মার্কসীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে সঠিকভাবে বুঝে স্ট্যালিনের অতি বিচক্ষণ নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ফাটলটিকে কাজে লাগায় এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্য ভেঙে মিত্রপক্ষকে হিটলারের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। যুদ্ধের পর ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা চার্চিলের উক্তির মধ্যে এর স্বীকৃতি রয়েছে। চার্চিল বলেছিলেন – স্ট্যালিন আমাদের সাম্রাজ্যবাদী বলেন, তিনি আমাদেরকেই আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি আপেক্ষিক স্থায়িত্ব হারিয়ে সংকট থেকে বাঁচার জন্য অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথ ধরে, যা ভিন্ন কৌশলে কেইনসীয় তত্ত্বেরই প্রয়োগ। এক্ষেত্রেও সরকারই বাজার সৃষ্টি করে। পার্থক্য এই যে এক্ষেত্রে ক্রেতাও সরকার। সরকার নিজেই সামরিক ব্যয়ের মাধ্যমে নিজের অস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জামের ক্রেতার ভূমিকা নেয়। কৃত্রিমভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চাঙ্গা রাখার জন্য সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। "সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবেই যুদ্ধের জন্ম দেয়" – লেনিনীয় এই তত্ত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালেও কার্যকর বলে ঘোষণা করেন স্ট্যালিন। এ বিষয়টিকে লেনিন ও স্ট্যালিনের শিক্ষাগুলির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে ভারতের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদের 'অর্থনীতির সামরিকীকরণ' বৈশিষ্ট্যটি আরও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, এতকাল পুঁজিবাদ সমরযন্ত্র চাঙ্গা রাখতে সামরিক উৎপাদন করেছে, এখন অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে সে সামরিক উৎপাদন করছে এবং সেজন্য বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে না পারলেও সর্বদা ছোটখাট যুদ্ধ করছে, তাও না পারলে সর্বদা যুদ্ধের হুমকি বজায় রাখছে। ১৯৬২ সালে তিনি বলেন – "সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ... বেপরোয়াভাবে অস্ত্র উৎপাদন এবং শিল্পের সামরিকীকরণ এবং ক্রমাগত বেশি করে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে ... বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠতে চাইছে। ... কিন্তু পরিস্থিতি সহজ করার পরিবর্তে সামরিকীকরণ পুঁজিবাদী দ্বন্দ্ব ও সংকটকে ক্রমাগত আরও বাড়িয়ে তুলছে। সংকট যত বাড়ছে, অর্থনীতিতেও তত সামরিকীকরণ ঘটছে।" (শিবদাস ঘোষ – নির্বাচিত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২-৪৩) পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনেতা ও সমরচক্র সংকট থেকে বাঁচার অলীক আশায় অস্ত্রপ্রতিযোগিতাকে ক্রমাগত বাড়াতে থাকে এবং এজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে তথাকথিত ঠাণ্ডাযুদ্ধের অজুহাত খাড়া করে। ১৯৪৬ সালে জাতিসঙ্ঘে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পূর্ণ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ এবং নির্মিত সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস করার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু

মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবির তা মানেনি। এই মানা বা না-মানাটা রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তিগত চাওয়া না-চাওয়ার প্রশ্নে নয়। এর মূল কারণটি সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে নিহিত।

সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের শক্তি, সমাজতন্ত্র শান্তির

পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদ উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে পারে না; উৎপাদনের নৈরাজ্য পুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; তাই বাজার-সঙ্কট পুঁজিবাদের স্বাভাবিক পরিণতি – এটা মার্কস ক্যাপিটালে দেখিয়েছেন। মার্কসের শিক্ষার ভিত্তিতে লেনিন দেখান – উপনিবেশ স্থাপন, অন্যদেশের বাজার, শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন এবং এরই তাগিদে যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বাঁচতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধ সর্বদা করা যায় না, পরদেশ লুণ্ঠনও ইচ্ছেমতো করা যায় না। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার চাঙ্গা করার চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সর্বদা যুদ্ধাতঙ্ক জিইয়ে রেখে সামরিক খাতে খরচ বাড়ায়।

অন্যদিকে, সমাজের সকলের সর্বাধিক প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে পরিচালিত পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। সমাজতন্ত্র মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত নয়। পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে ক্রমাগত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারবৃদ্ধি তার স্বাভাবিক নিয়ম। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের আগ্রাসনের আশঙ্কা না থাকলে সমাজতন্ত্রের অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজন নেই। সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র – দুই ব্যবস্থার এই মৌলিক চরিত্রগত পার্থক্যই সাম্রাজ্যবাদকে যুদ্ধবাজ ও সমাজতন্ত্রকে শান্তির শক্তিতে পরিণত করেছে।

সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সমরসজ্জার তাগিদ কেইনস নির্দেশিত রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধির তত্ত্বের প্রয়োগের প্রকৃতি বদলে দেয়। জনকল্যাণমূলক খাতের বদলে সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ বাজারকে কৃত্রিমভাবে চাঙ্গা করার এই চেষ্টাকে অনেকে কেইনসীয় নীতির দক্ষিণপন্থি প্রয়োগ বলে থাকেন। সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি কেবল অস্ত্রনির্মাতা শিল্পই নয়, ধাতুশিল্প, রাসায়নিক শিল্প থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত শিল্প অর্থাৎ গোটা অর্থনীতিতে কৃত্রিমভাবে চাহিদার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ অবধি পুঁজিবাদ এভাবেই মানুষ মেরে মুনাফা করার পথে টিকে আছে – দ্বিতীয় পথ তার সামনে নেই। এই সামরিক শক্তির জোরেই সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোটা দুনিয়ায় শান্তি, গণতন্ত্র এবং মানবতার বিরুদ্ধে হানাদারি চালাচ্ছে। অতীতে সমাজতন্ত্রের জুজু দেখিয়ে তারা তাদের যুদ্ধচক্রান্তকে একটা যৌক্তিকতা দেওয়ার চেষ্টা করত; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর সেই অজুহাতটি তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সন্ত্রাসবাদ তথা 'আল-কায়দা'র জুজু খাড়া করেছে। অথচ সকলেই জানেন, আফগানিস্তানে জনগণের নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন মদতেই গড়ে উঠেছিল আল-কায়দা। ওসামা বিন লাদেন তখন ছিলেন মার্কিন শাসকদের চোখের মণি। সন্ত্রাসবাদের অজুহাতটি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী এইজন্য যে, এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশের সীমায় আবদ্ধ নয়। যে কোনো দেশের শাসকদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে সশস্ত্র হানাদারি চালানো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে সম্ভব।

সামরিকীকরণ পুঁজিবাদের সঙ্কটের নিরসন ঘটাতে পারেনি

কিন্তু অর্থনীতির সামরিকীকরণ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কটের নিরসন তো করেই নি বরং তা নতুন এক সঙ্কট ডেকে আনে, তা হল মুদ্রাস্ফীতি ও সরকারি বাজেট ঘাটতির গুরুতর সমস্যা। বাজারে ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধি করার চেষ্টায় ঋণ করে হলেও ব্যয়বৃদ্ধি ঘটানো – শুধু সরকারের নয়, বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থা, এমনকি গৃহস্থ পরিবারগুলিকে পর্যন্ত ধার করে ভোগ্যপণ্য কেনার দিকে ঠেলে দেওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বমোট ঋণের পরিমাণ ৩০ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। বিশ শতকের সাতের দশকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছর পঁচিশেকের মধ্যেই কেইনসীয় দাওয়াই প্রয়োগের পরিণামে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে নতুন সঙ্কট দেখা দেয়, তাহল বিপুল ঘাটতি বাজেট। সমস্যাটা প্রথম ধরেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার। দীর্ঘদিন একটা লক্ষণ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে দেখা যাচ্ছিল, তাহল স্ট্যাগফ্লেশন। আগে বলা হত মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে বাজার চাঙ্গা হয়, কিন্তু সত্তরের দশকে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় দেখা গেল মুদ্রাস্ফীতি এবং মন্দা হাত মিলিয়ে চলছে। বাজারের অভাবে পুঁজিবিনিয়োগ থমকে গিয়েছে। উদ্বৃত্ত পুঁজি একটা গুরুতর সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছে, ফাটকা বাজারে রমরমা। এই অবস্থায় প্রথমে মার্গারেট থ্যাচার ও পরে রোনাল্ড রেগান বললেন – সরকারি খরচ কমাতে হবে। এত ঘাটতি বাজেট করা যাবে না। ব্রিটেনে সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া শুরু হল। এইসব লক্ষণ দেখে অনেকেই বললেন

কেইনসীয় দাওয়াই ব্যর্থ হয়েছে। বুর্জোয়া দুনিয়ায় নতুন আর্থিক নীতির প্রবর্তন শুরু হয়েছে। অর্থনীতিকে সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া, এবং ধনীদের বিশেষত কর্পোরেট সংস্থাগুলির ট্যাক্স কমানো – এটাই সঠিক রাস্তা। কয়েক বছর আগেও যে বুর্জোয়া গণমাধ্যমগুলি অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ ও জনকল্যাণমুখী পরিষেবার (বিশেষত ব্রিটেনের চিকিৎসা ব্যবস্থার) গুণগান করত, তারাই ভোল পাল্টে বেসরকারিকরণ ও অর্থনীতিকে সরকারি হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার পক্ষে ব্যাপক প্রচার শুরু করে। ভাবখানা যেন পুঁজিবাদ আবার নবযৌবন পেয়েছে। বলাবাহুল্য এ বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যা। বুর্জোয়া ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় সহায়তাতেই টিকে আছে, কেবল কেইনসীয় তত্ত্বের প্রয়োগকৌশল বদলেছে। পুঁজিবাদও নবযৌবন ফিরে পায়নি। মহামন্দার সময় কেইনস বলেছিলেন – সরকারকে উদ্যোগী হয়ে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। এখন বুর্জোয়ারা বলল – সরকারি উদ্যোগের দরকার নেই, উৎপাদন বাড়লেই চাহিদা তৈরি হবে।

তারা টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণে রেখে মুক্তবাজার চালু করার কথা বলল। এজন্য অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যানকে প্রচারের আলোয় আনা হল। তাকে ১৯৭৬ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। অথচ যে তত্ত্বের জন্য তিনি নোবেল পেলেন সে-তত্ত্ব তিনি দিয়েছেলেন ৫০/৬০ বছর আগে। বোঝা যায়, তখন তাকে বুর্জোয়াদের দরকার ছিল না, তাই অ্যাকাডেমিক পরিধির বাইরে তাকে আনা হয়নি। এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির ধোঁকাবাজি তাদের দরকার তাই তাকে যুগসেরা অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রচার করা হল।

ফ্রিডম্যান বোধ হয় জানতেন যে একচেটিয়া পুঁজির যুগে মুক্তবাজার টিকবে না। তাই তিনি সরকারকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের কর ছাড় এবং বেসরকারি পুঁজির লুণ্ঠনের পথ খুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ তিনি সরকারকে ঘুরপথে মালিকশ্রেণীকে সহায়তা করার কথাই বললেন। ফলে তার এ তত্ত্ব বাস্তবে কেইনসীয় মূল দাওয়াইয়েরই সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে দেখা দিল। অর্থাৎ থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোর। যাহোক, সংকটের ধাক্কা থেকে বাঁচতে বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বুর্জোয়ারা বাজার অর্থনীতির যে জয়গান শুরু করেছিল তা-ই শেষপর্যন্ত বর্তমান বিশ্বায়নের ধারণায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বায়ন লেনিন নির্দেশিত সাম্রাজ্যবাদেরই পরিণাম

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তিত ও তীব্রতর সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি কিছু নতুন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু মৌলিক চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। লেনিন বর্ণিত পাঁচটি লক্ষণ আজ বিশ্বায়নের মধ্যে আরও প্রকট। প্রথমত, পুঁজির একচেটিয়াকরণ আজ অকল্পনীয় মাত্রায় পৌঁছেছে। একটি মাত্র মার্কিন কর্পোরেট সংস্থা জেনারেল মোটরস-এর বাৎসরিক আয় বাংলাদেশের মতো গোটা দশেক দেশের মোট আয়ের সমান। দ্বিতীয়ত, গোটা বিশ্বের ব্যাংকগুলি আরও বিশাল আকৃতি নিয়েছে শুধু নয়, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে বৈদেশিক শাখাগুলির সঙ্গে মূলকেন্দ্রের যোগাযোগ হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে, ব্যাংকপুঁজির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। পশ্চাদপদ দেশগুলির সম্পদ লুণ্ঠনে অগ্রসর দেশের লগ্নীপুঁজির প্রধান বাহক হল বিদেশী ব্যাংক। লেনিন দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদের শুরুর যুগে ব্যাংকগুলি বাণিজ্যিক লেনদেন করত এবং জমা টাকাকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্যাংকগুলি শিল্পপুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ধনকুবের গোষ্ঠী তৈরি করে। অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে পুঁজি চলাচলের জন্য অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান ছিল শেয়ারবাজার, সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্যাংকগুলি শেয়ারবাজারের গুরুত্বকে গৌণ করে দিয়ে নিজেরাই এক একটি শেয়ারবাজারে পরিণত হয়। বর্তমানেও বিশ্বব্যাপী বৃহৎ পুঁজির যে মার্জার অ্যাকুইজিশন ঘটছে, অতি বৃহৎ পুঁজিগুলি পরস্পর হাত মেলাচ্ছে, এবং তুলনায় ক্ষুদ্র পুঁজিকে গিলছে – এসবই ঘটছে প্রধানত বিশালাকৃতি ব্যাংকগুলির মাধ্যমে।

তৃতীয়ত, বিশ্বব্যাপী পুঁজি রপ্তানি অতীতের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিপুল ঘাটতি বাজেট ও ঋণ সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থেই মার্কিন সরকার বিদেশী ঋণ আমানত চাইছে। এটা দেখিয়ে অনেকে বলছেন, বিশ্বায়নের সুযোগে পশ্চাদপদ দেশও শিল্পোন্নত দুনিয়ায় পুঁজি পাঠাবার সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু এই সুবিধা নিতে হলে পুঁজির যতটা জোর দরকার গরিব দেশগুলির তা নেই। শিল্পোন্নত দেশে পুঁজি লগ্নীর যে রাস্তা কাগজে-কলমে খুলে গেছে, সে রাস্তায় যাওয়ার কিছুটা ক্ষমতা রয়েছে ভারতের, যার পুঁজির জোর আক্ষরিক অর্থে অনুন্নত ও পশ্চাদপদ দেশগুলির চেয়ে অনেক বেশি। চতুর্থত, লেনিন যে একচেটিয়া গোষ্ঠীর জোট-এর কথা বলেছিলেন বর্তমানে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা এরই সম্প্রসারিত ও কেন্দ্রীভূত রূপ। এছাড়া বড় বড় মালটিন্যাশনাল কোম্পানি ও ব্যাংকগুলি প্রায় সবগুলিই গ্রুপ অব কোম্পানিজ বা ব্যাংকস। পঞ্চমত,

প্রত্যক্ষভাবে পরদেশ দখল না করেও অন্যদেশের ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াদের সাথে যোগসাজশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যে সম্ভব সেটা লেনিনই দেখিয়ে গিয়েছিলেন, বর্তমানে নয়া-ঔপনিবেশিকতা তা-থেকে পৃথক নয়।

নয়া-ঔপনিবেশিকতার যে তত্ত্বগত ধারণা লেনিনই দিয়েছেন, সেই নয়া-ঔপনিবেশিকতাই বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রাধান্য নিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ নয়া-ঔপনিবেশিকতার তত্ত্বগত সম্প্রসারণ ঘটেছে। আবার পূর্বতন ব্রিটিশ উপনিবেশ, ভারতের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণী দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তার নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে ও আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। এ ব্যাপারে ভারত যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে এগুচ্ছে – এ ঘটনাও নতুন নয়। লেনিনই দেখিয়েছেন – বিশ শতকের শুরুতে পর্তুগাল সাম্রাজ্যবাদী দেশ হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার নিজস্ব স্বার্থে উপনিবেশসহ পর্তুগালের রক্ষাকর্তা হিসাবে কাজ করছিল। অর্থাৎ বর্তমান যে যুগে আমরা বাস করছি তা চরিত্রের দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। পার্থক্য শুধু এই, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদের সংকট যত বেড়েছে ততই পশ্চাদপদ দেশগুলোর ওপর তাদের নয়া-ঔপনিবেশিক আক্রমণ আরো শাণিত হয়েছে। সেই আক্রমণ যেমন বিশ্বায়ন, বেসরকাররিকরণের ফতোয়া দিয়ে আসছে তেমনি আসছে সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র হানাহানির মধ্য দিয়ে। দু ধরনের আক্রমণের লক্ষ্য একটাই, তাহল, অপর দেশের পণ্যের বাজার দখল করা, শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল লুণ্ঠন। বিশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন সাম্রাজ্যবাদকে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও অবাধে আক্রমণ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

শিল্পোন্নত দেশগুলি সংরক্ষণ ও ভর্তুকি বহাল রাখছে

আমরা আগেই বলেছি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সংকট থেকে বাঁচাবার তাগিদে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ক্রমাগত সামরিক ব্যয় বাড়িয়েও বাজারবৃদ্ধি করতে পারেনি; উল্টো ঘাটতি বাজেট সেইসব রাষ্ট্রে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী সরকারের ঘাটতি মেটাতে এবং সংকট জর্জরিত পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফা বাড়াতে তারা কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো, জনসাধারণের ওপর করভার বৃদ্ধি, জনকল্যাণ খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস ও বেসরকারিকরণের কর্মসূচিকে সর্বরোগহর দাওয়াই হিসাবে ঘোষণা করে। ভাবখানা যেন এতদিন পুঁজির সীমাহীন বিকাশক্ষমতা ও জনকল্যাণকর গুণাবলীকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বেঁধে রাখা হয়েছিল; এজন্যই অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে গিয়েছিল। এবার গণতান্ত্রিক রীতি মেনে তাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে!

বিশ্বায়নের প্রবক্তারা বলছেন, ব্যক্তিপুঁজি, ব্যক্তিউদ্যোগের মধ্যে যে কল্যাণকর শক্তি নিহিত আছে বিশ্বায়নের কর্মসূচিতে তার বিকাশের পরিসর করে দেওয়া হচ্ছে। এই অজুহাতে শিল্পোন্নত দেশগুলি উদ্যোগ নিয়ে পশ্চাদপদ দেশগুলিতে, একদিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/উদ্যোগগুলি বেসরকারি পুঁজির কাছে পানির দরে বেচে দেওয়া, ঘাটতি কমানোর নামে সরকারি বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য-সহ সমস্ত কল্যাণমূলক ও পরিষেবা খাতে সরকারি বরাদ্দ হ্রাস করার ফতোয়া দেয়, অন্যদিকে ব্যক্তি নাগরিক ও নাগরিক সমাজকে (সিভিল সোসাইটি) উদ্যোগী করে তোলার নামে বিশেষত পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে এনজিও-র জাল বিছানো; সমবায় মাইক্রোক্রেডিট প্রভৃতির বিপুল সাফল্যের প্রচারে আকাশ ভরিয়ে দেয়।

বাস্তবে মাইক্রোক্রেডিটের দ্বারা একদিকে গ্রামের অত্যন্ত গরিব পরিবারের শ্রমশক্তিকে বিশেষত নারীশ্রমকে তারা ব্যাংকপুঁজির শোষণের জালে টেনে আনে, অন্যদিকে সমাজের নিচুতলার গরিবকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার ক্ষেত্রে নয়া-উদারবাদী পদক্ষেপের পিছনে "তাত্ত্বিক" সমর্থন যোগায়। এনজিও'র মাধ্যমে উদ্যোগী সামাজিক শক্তিকে শোষণ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে সরিয়ে সংস্কারবাদের কানাগলিতে ঢুকিয়ে দেয়। এজন্যই দেশে দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী মাইক্রোক্রেডিট, সেলফ হেল্প গ্রুপ, ইত্যাদি নানা নামের নয়া-উদারবাদী ও এনজিও'দের সামাজিক উদ্যোগের ঢাক পেটাচ্ছে। শিল্পে পশ্চাদপদ দেশগুলির পুঁজিবাদী উন্নয়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কোটি কোটি ডলার উদ্বৃত্ত পুঁজি সুদে ঋণ দেয় এবং তার শর্ত হিসাবে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, কল্যাণমূলকখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় হ্রাস, স্বাস্থ্য-শিক্ষা প্রভৃতি পরিষেবা ক্ষেত্রকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা, শিল্প-কৃষিসহ অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে শুল্ক ও আইনগত সংরক্ষণ তুলে দিয়ে সেগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুটের ক্ষেত্রে পরিণত করা – প্রভৃতি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। পরিণামে এসব দেশে জিডিপির অঙ্ক হয়ত বাড়ছে, তৈরী হচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনী। কিন্তু অন্যদিকে গরিব আরো গরিব হচ্ছে, মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠছে, শিক্ষা-চিকিৎসা তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, বেকারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে।

অথচ মুখে উদারীকরণের কথা বললেও, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজও অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পুরোমাত্রায় বজায় রেখেছে। রোনাল্ড রেগানের সময়ই মার্কিন সামরিক ব্যয় মোট জাতীয় উৎপাদনের ৪.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬.১ শতাংশ হয় এবং সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যয় ২১.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩ শতাংশ হয়। (সূত্র : মান্থলি রিভিউ, সেপ্টেম্বর ২০০৬) ১৯৮০ সালের মুদ্রামূল্য অনুযায়ী শিল্পোন্নত চারটি দেশের ও ন্যাটো সমরজোটের সামরিক ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে যায়।

[৮০ সালের মুদ্রামূল্য হিসাবে, বিলিয়ন ডলার]

দেশ	১৯৭০	১৯৮০
ইউএসএ	৭৬.৫১	১৪২.৭০
জার্মানি	৬.১৯	২৫.১২
ব্রিটেন	৫.৯৫	২৪.৪৫
ফ্রান্স	৫.৯৮	২০.২২
ন্যাটো জোটের সমস্ত দেশ	১০৩.০৭	২৩৭.৭৮

(সূত্র : ইনফ্লেশন আনডার ক্যাপিটালিজম টুডে; সম্পাদক - প্রোফেসর এস.এম. নিকিতন, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৮৪)

অতি সম্প্রতি গোটা বিশ্বের সামরিক ব্যয় ১০০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, তার অর্ধেকের বেশি একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ২০০৪ সালে মার্কিন সরকারের ঘোষিত সরাসরি সামরিক ব্যয় ছিল ৪৬২ বিলিয়ন ডলার, মাথাপিছু ১২৫২ ডলার। ২০০৪ সালে ন্যাটো জোটের সামরিক ব্যয় ছিল ৭০৯ বিলিয়ন ডলার। (সূত্র : নিনহুয়া ওয়েবসাইট)

এছাড়া উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আমদানির উপর শুল্ক ও শুল্ক-বহির্ভূত নানা বাধার ব্যবস্থা রেখেছে যার অন্যতম হল কোটা ও লেবার স্ট্যান্ডার্ড। শিশুশ্রম রয়েছে এই অজুহাতে গরিব দেশের যে কোন রপ্তানি পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে মার্কিন সরকার। কৃষিক্ষেত্রেও তারা বিপুল অঙ্কের ভর্তুকি আজও চালু রেখেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপানসহ বহু শিল্পোন্নত দেশের সরকার কৃষি, পশুপালন, অ্যাগ্রো-ইন্ডাষ্ট্রি, কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ সরকারি সাহায্য দেয়। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রতিটি বৈঠকে শিল্পে পশ্চাদপদ দেশগুলি ভর্তুকি কমাবার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলিকে চাপ দিচ্ছে। কিন্তু বৃটেনসহ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কৃষি ভর্তুকি কমাতে নারাজ। গ্যাটের আগে ডাংকেল প্রস্তাবে কৃষি ভর্তুকি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীরা তাতে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত মরক্কোর মারাকাসের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের বিপুল ভর্তুকির ২০ শতাংশ কমাবে, পশ্চাদপদ দেশগুলি কৃষি ভর্তুকি কৃষিজাত আয়ের ১০ শতাংশের বেশি করতে পারবেনা।

এর ফল কি দাঁড়াবে? জাপানের কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল কৃষি আয়ের ৯৩ শতাংশ, চুক্তি অনুযায়ী জাপান তা ৭৩ শতাংশ করবে। অন্যদিকে পশ্চাদপদ দেশগুলির মোট ভর্তুকিই অনেকক্ষেত্রে ১০ শতাংশ নয়। ২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষিতে ভর্তুকি দিত কৃষক প্রতি ২১০০০ ডলার, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৃষকপ্রতি ভর্তুকি ১৭০০০ ডলার, জাপান দেয় ২৮০০০ ডলার। (সূত্র : ভারতের পত্রিকা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৩.১.০২) ভর্তুকির মোট অঙ্কটা অনেক পশ্চাদপদ দেশের মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়ের চেয়ে বেশি। বিশ্বায়ন এ ধরনের সাম্যই আনছে। এ ধরনের সাম্যের পরিণতিতেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলের অর্থনীতি ধ্বসে পড়েছে। সার্কভুক্ত গরিব দেশগুলির কোটি কোটি গরিব চোখের জল ফেলছে, চাষীর ঘরে খাদ্য নেই, মজুরের কাজ নেই সাম্রাজ্যবাদী ভোগবাদের নির্লজ্জ আকর্ষণীয় প্রচারে দেশের জনগণের সংস্কৃতি ধ্বংস হচ্ছে।

বিশ্বায়নের বাতাবরণে, যখন বলা হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্র অতীতের ধারণা; এখন আমরা 'গ্লোবাল ভিলেজে'র (global village) যুগে পৌঁছেছি – সেই সময়েই আফগানিস্তান-ইরাকে মার্কিন বাহিনী, লেবাননে মার্কিন মদতপুষ্ট ইসরায়েলি বাহিনী নৃশংসতায় আটিলা বা চেঙ্গিজ খাঁকেও লজ্জা দিচ্ছে। মার্কিন সমরচক্রের অঙ্গুলি হেলনে ইরাকের বশংবদ সরকার সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলাচ্ছে। সর্বশেষ এরা আল-কায়েদার ঘাঁটি ধ্বংসের ধুয়া তুলে সোমালিয়ায় মিসাইল ও বোমারু বিমান নিয়ে হামলা চালিয়েছে।

বিশ্বের ওপর বিশ্ববাসীর স্বাভাবিক সাম্যভিত্তিক অধিকারের প্রসঙ্গ তুলে পরদেশলোলুপ সাম্রাজ্যবাদকে নজরুল প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন – "তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিবে ভোগ, / এই পৃথিবীর নাড়ি সাথে আছে সৃজন দিনের যোগ। / ... যে আকাশ হ'তে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টি-ধারা / সে আকাশ হ'তে বেলুন উড়ায়ে গোলাগুলি হানে কা'রা? / উদার আকাশ বাতাসে কাহারা / করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা? / তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কার কামান?"

তেলসম্পদ দখল ও ডলারের আধিপত্য রক্ষায় মার্কিন কর্তারা মরিয়া

লেনিন তাঁর ঐতিহাসিক পুস্তিকাটিতেই ১৯১৬ সালে, শুধু কয়লা নয়, বিদ্যুৎশক্তি ও তেল দখলের জন্য লগ্নীপুঁজির কাড়াকাড়ির সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। ১৯১৬ সালে শক্তির উৎস হিসাবে তেলের ব্যবহার যখন প্রায় শুরুর পর্যায়ে, তখনই লেনিন বিশ্বকে ভাগাভাগি করে দখল করার বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, অংশত ফ্রান্স তেলসম্পদ কব্জা করে। পরবর্তী কুড়ি বছরে বিশ্বঅর্থনীতিতে শক্তির উৎস হিসাবে তেলের গুরুত্ব অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেনের সহযোগিতায় গায়ের জোরে ফিলিস্তিনি ভূমি দখলের মাধ্যমে জায়নবাদী ইসরায়েল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইসরায়েলকে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করে এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে হাতমিলিয়ে আরব জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে দমন ও ধ্বংস করে। এর ধারাবাহিকতায়ই তারা ২০০৩ সালে ইরাক দখল করেছে। এক্ষেত্রে তেলের সঙ্গে আরও একটা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ জড়িত; তাহল বিশ্ববাণিজ্যে ডলারের আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থ। সকলেই জানেন রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক এবং পারিবারিক সবদিক থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হল সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত রাষ্ট্র। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভোগ্যপণ্য আমদানি করে। জাপান, চীন-সহ বিশ্বের বহু দেশের রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির স্বাস্থ্য নির্ভর করে মার্কিন আমদানির ওপর। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল ঘাটতি। স্বাভাবিক পুঁজিবাদী বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্বের জোরে নয়, ছলে বলে কৌশলে বিশ্ববাণিজ্যে ডলারের আধিপত্যের সুযোগ নিয়েই মার্কিন শাসকরা বাজেট ঘাটতি, বৈদেশিক বাণিজ্যঘাটতি এবং ঋণের বোঝা সামাল দিচ্ছে দীর্ঘদিন। ক্রমাগত বিদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার আনা সম্ভব হলে তবেই বিপুল ঘাটতি ও ঋণজনিত সংকট সামাল দেওয়া সম্ভব, কিন্তু তার প্রধান শর্ত হল ডলারের মূল্যমানের স্থিরতা। ডলারের মূল্যমান স্থির রাখতে না পারলে বিদেশী আমানতকারীরা ডলারে অর্থ জমা করতে চাইবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় নিশ্চিত হওয়ার পরই ১৯৪৪ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটনউডে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নেতা বদলের ফয়সালা হয়। ব্রিটিশ পাউন্ডের বদলে ডলার বিশ্ববাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে। এই স্বীকৃতি পেতে মার্কিন সরকার সর্বদা ৩৫ ডলারের বদলে ১ আউন্স সোনা দিতে অঙ্গীকার করে। এর পরই ডলার-সোনা বিনিময় মূল্যের স্থিরতা বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা টানতে থাকে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তেল বিক্রির বিশাল অর্থ ডলার (পেট্রোডলার) হিসাবে মার্কিন ব্যাংক এবং ট্রেজারি বন্ডে জমা হতে থাকে। বিপুল পরিমাণ পেট্রোডলার মার্কিন অর্থনীতির ভারসাম্য রাখায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কিন্তু সোনার সঙ্গে ডলারের স্থির বিনিময়মূল্য ১৯৭১ সালে এসে ধাক্কা খায়। সংকটগ্রস্ত মার্কিন সরকার সোনার সঙ্গে ডলারের মূল্যের সংযোগ ছিন্ন করে। এর ফলে মার্কিন সরকারি বন্ডে এবং মার্কিন ব্যাংকে বিপুল বিদেশী অর্থ আসাটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

অথচ বিপুল ঋণ ও ঘাটতিতে ভারাক্রান্ত অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে ক্রমাগত বিদেশী মুদ্রা ডলারে পরিবর্তিত হয়ে মার্কিন অর্থনীতিতে ঢোকার প্রক্রিয়াটা অটুট থাকলে মার্কিন কর্তাদের সুবিধা। তাই ডলারে বিদেশী অর্থের আমদানি নিশ্চিত করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রভাবকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। তার সবচেয়ে সুবিধা ছিল এই যে, সাম্রাজ্যবাদী অপর কোনো দেশই সামরিক শক্তিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সেই স্তরে ডলারের কোনো বিকল্প ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শিরোমণির ভূমিকা আঁকড়ে থাকার উদ্দেশ্যে একদিকে সমরশক্তি বৃদ্ধি করা, অন্যদিকে দোসর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে পণ্য আমদানি এবং ডলারের আধিপত্য রক্ষা করার জন্য মার্কিন সরকার মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৯১ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপের দেশগুলির মিলিত মুদ্রা ইউরোর আবির্ভাব ডলারের ভবিষ্যতকে কিছুটা অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। এককভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুঝে উঠতে না পেরে, নিজস্ব আধিপত্য বাড়াবার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলি একজোট হয়ে ডলারের বিকল্প হিসেবে ইউরো চালু করে। সেই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি আফ্রিকার বহু দেশে তেল আবিষ্কার ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য রূপ নিতে থাকে।

এক্সন, মবিল, পেট্রোনাশ বা শেভ্রনের মতো মার্কিন অয়েল কর্পোরেট আফ্রিকার তেলসম্পদ লুটতে পুঁজি ঢালে, অন্যদিকে এসব দেশের শাসকদের সঙ্গে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সখ্য প্রচুর। ফলে সবটা মিলিয়ে বিশ শতকের শেষে মার্কিন-ইউরোপ বাণিজ্যিক লড়াই তীব্র রূপ নেয় যা মুদ্রার ক্ষেত্রে ডলার-ইউরো সংঘাত রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ইউরো চালু করে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিতভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলার চেষ্টা করছে, যা আজও আপসের পরিধি ছাড়ায়নি। মার্কিন তেল কোম্পানিগুলির প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ যে তিনটি দেশকে "শয়তানের ঘাঁটি" বলে চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে ইরাক তেল কেনাবেচায় ইউরো চালু করেছিল। ইউরো চালুর প্রস্তাবে ১৯৯৮ সালেই ইরান খুশি হয়ে ইউরোকে ডলার-শৃঙ্খল থেকে মুক্তির প্রতীক বলে চিহ্নিত করে। পরবর্তীকালে ইরানের তেলখনিতে চীন ও রাশিয়া পুঁজিবিনিয়োগ করে; উত্তর কোরিয়াও ইউরোমুখী। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোর তালিকায় পঞ্চম স্থানে থাকা ভেনিজুয়েলাও লেনদেনে ইউরোকে বেছে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে সে তার তেলসহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার দেখাদেখি বলিভিয়াও তার গ্যাসসম্পদ জাতীয়করণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে বুশ প্রশাসন প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছে। তারা ইতোমধ্যে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলির স্বার্থে মধ্য এশিয়ার তেলসম্পদের দিকে হাত বাড়াতে আল-কায়দার অজুহাত দেখিয়ে আফগানিস্তান দখল করেছে; ইরাক গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত করছে – এই মিথ্যাপ্রচারের ঝড় তুলে ইরাক দখল করেছে। আফ্রিকার তেলসমৃদ্ধ দেশ অ্যাঙ্গোলা, সুদান ও নাইজেরিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মদত দিয়ে জাতি দাঙ্গা লাগিয়েছে; হামলা চালিয়েছে সোমালিয়ায়। ভেনিজুয়েলা এবং উত্তর কোরিয়াকে ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছে। লাতিন আমেরিকান জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রেরণার উৎস সমাজতান্ত্রিক কিউবাকে ধ্বংস করা, এমনকি ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করার নির্লজ্জ অপচেষ্টা ক্রমাগত করে চলেছে।

সাম্রাজ্যবাদী এই হুমকি থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। ইতোমধ্যে এদেশের বেশিরভাগ গ্যাসক্ষেত্র এখানকার নতজানু শাসকশ্রেণীর সহায়তায় বিভিন্ন মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানির দখলে চলে গেছে। তারা কয়লাসম্পদ দখলেরও পাঁয়তারা চালাচ্ছে। কক্সবাজারের সমুদ্র উপকূলের বালিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন মূল্যবান ধাতুর মজুদ দখলেরও প্রয়াস চলছে। দেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর ও ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বন্দরও তারা দখলে নিতে চায়। অন্যদিকে তাদের এই দখলদারিত্বকে নিরাপদ করার স্বার্থে তারা সোফা, টিফা-সহ বিভিন্ন ভয়ঙ্কর চুক্তি বাংলাদেশের ওপর চাপাতে চাইছে। ইতোমধ্যে হানা, এমওআই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত চুক্তিসহ বেশ কয়েকটি দেশবিরোধী চুক্তি তারা স্বাক্ষর করে নিয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ চুক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একসময় আমাদের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্বকেও বিপন্ন দশায় ঠেলে দিতে পারে।

উন্নয়নের ধোঁকাবাজি, প্রতারণার নতুন কৌশল

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে, সাম্রাজ্যবাদ কোনদিনই বলেনি যে, সে পরদেশ লুণ্ঠন করতে গিয়েছে। স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিল বর্বর জনগোষ্ঠীর হাত থেকে বিপুল সোনা ও প্রাকৃতিক সম্পদকে "মানুষের" কাজে লাগিয়ে ভাগ্য ফেরাতে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকায় গিয়েছিল আলোর সন্ধান দিতে, আর আমাদের উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসকরা এসেছিল অসভ্য জাতিকে সুসভ্য করতে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের অকুণ্ঠ সাহায্য ও ভারতের শাসকদের সাহায্যের উদ্দেশ্য যে এক ছিল না, তা ক্রমশই পরিষ্কার হয়েছে। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলি পশ্চাদপদ দেশগুলির অগ্রগতির জন্য কাগজে কলমে গভীরভাবে চিন্তিত। এজন্য বিশ শতকের প্রায় শেষকালে তারা নতুন উন্নয়ন তত্ত্ব হাজির করেছে; এর নাম দেওয়া হয়েছে নিও ক্লাসিক্যাল গ্রোথ থিওরি। আমরা আগেই বলেছি, বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঁজিবাদের মুমূর্ষ অবস্থাটা আড়াল করে দেখাতে চায় যেন পুঁজিবাদ নবযৌবন ফিরে পেয়েছে। তাই অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে ক্লাসিক্যাল অর্থনৈতিক তত্ত্বকে নতুন মোড়কে খানিকটা রদবদল করে পেশ করেছে। কিন্তু খানিকটা রদবদল যা তারা করেছে, তার ফলাফল মারাত্মক। এই পরিবর্তনের ফলে পুঁজিবাদী বিকাশের যুগের একটা তত্ত্ব বাস্তবে নয়া ঔপনিবেশিক আক্রমণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

ক্লাসিক্যাল উন্নয়নের তত্ত্ব যখন এসেছিল তখন সাম্রাজ্যবাদ ছিল না। সামন্তী বন্ধ্যা অর্থনীতি ভেঙ্গে পুঁজিবাদ তখন উৎপাদনের ও সভ্যতার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সেই যুগে অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবিদেরা প্রধানত তিনটি বিষয়কে উন্নয়নের মাপকাঠি ধরেছিলেন –

১। পুঁজির সঞ্চয়।

২। জনসংখ্যা ও শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি।

৩। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।

মনে রাখা দরকার, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে পুঁজিবাদের বাজার সংকট এতটা ছিল না, একচেটিয়া পুঁজিও এ পরিমাণে ছিল না। ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল এটা ধরে নিয়েই যে, বাজার ক্রমাগত বাড়বে, ফলে পুঁজি সঞ্চয় এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কেবলই সমৃদ্ধি আনবে। অর্থাৎ উৎপাদনবৃদ্ধি করলেই চাহিদাবৃদ্ধি ঘটবে।

দর্শনের দিক থেকে মূলত ভাববাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী হওয়ায়, বস্তুজগৎ তথা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অবজেকটিভ নিয়ম ক্লাসিক্যাল তাত্ত্বিকরা ধরতে পারেন নি। সঠিক অবজেকটিভ নিয়মটা ধরেন মার্কস ও এঙ্গেলস। চিন্তাপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় মার্কস ও এঙ্গেলস শুরুতে আলাদা আলাদাভাবে, পরস্পরকে না জেনেও এবং দুই পৃথক জায়গা থেকে মূলগতভাবে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। পরবর্তী জীবনে এই দুই মহান নেতা যৌথভাবে মার্কসের নেতৃত্বে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির ডায়ালেকটিকসটি দেখিয়ে দেন। মার্কস-এঙ্গেলস দেখান, পুঁজির ক্রমপুঞ্জিভবন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পুঁজিবাদকে অনিবার্যভাবে বাজার সংকটের দিকে ঠেলে দেবেই। শোষণের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পুঁজিবাদ ক্রমাগত বাজারবৃদ্ধি ঘটাতে পারেনা। প্রযুক্তির উন্নয়নের সুযোগ নিয়ে শোষণকে তীব্র থেকে তীব্রতর করেও পুঁজিবাদ বাঁচতে পারেনা। মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির শোষণমূলক চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞানের আলোকে মার্কস পুঁজিবাদবিরোধী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন হতে পারে – পুঁজির পুঞ্জীভবন, একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নীপুঁজির জন্ম, সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব এবং পুঁজিবাদের বিশ্বজনীন তৃতীয় তীব্র সাধারণ সংকটের যুগে পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকেরা ঐতিহাসিকভাবে নিঃশেষিত নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব প্রচার করছে কেন? এর কারণ হল, চরম সংকটে জর্জরিত শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদের আজ এমন একটা তত্ত্ব চাই যা দিয়ে সে তার সংকটের বোঝাটা দুর্বল দেশের ঘাড়ে চাপাতে পারে; আবার প্রগতির ভান দেখিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে সমাজবিপ্লবের চেতনাকে বিপথগামী করতে পারে। নিও ক্লাসিক্যাল উন্নয়ন তত্ত্ব এমনই একটা অস্ত্র যার মুল কথা ও মূল পদক্ষেপগুলি আগেই ওয়াশিংটন ঐকমত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিশদ দেখিয়েছি। এখানে স্বল্প কথায় তার পুনরাবৃত্তি অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই তত্ত্বের মূল কথা হল – উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ, ও বিশ্বায়ন। এই তত্ত্বে অগ্রগতির নিরিখ হল জিডিপি বৃদ্ধি, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন নয়। জিডিপি বৃদ্ধি বলতে বোঝায় কৃষি, শিল্প, পরিষেবাসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনের মোট মূল্যের বৃদ্ধি, যদিও তার সঙ্গে ঋণকেও এখানে আয় হিসাবে দেখানো হয়। বিদেশী বিনিয়োগকেও এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদিও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা নানা প্রক্রিয়ায় ফি বছর বিনিয়োজিত অর্থের চেয়েও বেশি অর্থ দেশ থেকে নিয়ে যায়। বাস্তবে দেখা গিয়েছে, জিডিপি বৃদ্ধির নিরীখে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনমানের পরিস্থিতি বোঝা যায় না। আয়ের বৈষম্য এবং সামাজিক বৈষম্যের সত্য চিত্রও ধরা পড়ে না। এই কারণেই, কোন মার্কসবাদী তো নয়ই, মানবদরদী কেউই নিছক জিডিপি বৃদ্ধিকে উন্নয়নের নিরীখ বলে মেনে নিতে পারে না। এ হল আসল মাপটা গোপন করার জন্য মাপকাঠিটা পাল্টে দেওয়া। এহেন "উন্নয়নের" ফলে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি, বিশ্বমানের পেশাজীবী এবং ফটকাবাজদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটে। যেমন, আসিয়ান সচিবালয় প্রদত্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রতিবেশী মায়ানমারে ২০০৩-০৪ সালে গড় জিডিপি বৃদ্ধির হার ১১.২% অর্থাৎ ভারতের বৃদ্ধি গড় ৭-৮% থেকেও বেশি। আবার মালয়েশিয়া, যে দেশটা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, এবং প্রধানমন্ত্রী মহাথির আন্তর্জাতিক ফোরামে বার বার মালয়েশিয়ার বিপর্যয়ের জন্য শিল্পোন্নত দুনিয়াকে দায়ি করেছেন, সেই মালয়েশিয়ার গড় জিডিপি বৃদ্ধির হার ৫.২%। প্রতিবেশী ভারতবর্ষে, ব্যঙ্গ করে যাকে বলা হয়, "হিন্দুগ্রোথ রেট", অর্থাৎ তিন শতাংশ, তা থেকে এখন ৭/৮ শতাংশ হারে জিডিপি বাড়ছে, অন্যদিকে বেকার বাড়ছে, চাষী আত্মহত্যা করছে; অথচ সরকারি হিসাবে দারিদ্র কমছে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নির্দেশিত এই নয়া উন্নয়ন তত্ত্ব মানতে যেসব পশ্চাদপদ দেশকে বাধ্য করা হয়েছে, কয়েক বছর পরই একে একে সেখানে ধস নেমেছে। শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয়েছিল এবং গোটা দুনিয়ার রপ্তানিভিত্তিক অর্থনৈতিক নীতির (এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইকনমি) জয়গান করা হয়েছিল। কিন্তু জয়গান যারা করলেন তারা একটু ভাবলেই বুঝতে পারতেন, সবাই যদি রপ্তানি করতে চায় তাহলে কিনবে কে?

রপ্তানির এত বাজার কোথায়? ১৯৮৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি ছিল মাথাপিছু ১৩৬৫ ডলার। এই হারে যদি "তৃতীয় বিশ্বের" দেশগুলি রপ্তানি করতে চায় তবে মোট রপ্তানি হতে হবে ৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। অথচ ১৯৮৯ সালে সমগ্র বিশ্ববাজারে বাণিজ্যের পরিমান ছিল ২.১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও কম। অর্থাৎ সকলের জন্য বাজার নেই। বিশেষ কারণে বিশেষ দেশকে শিল্পোন্নত দেশগুলি বাজার দিলে তবে বিক্রি হয়। যেমন জাপান বা চীন মার্কিন বাজার নির্ভর। কোরিয়ার ক্ষেত্রেও রপ্তানিভিত্তিক উন্নয়নটা দীর্ঘদিন চলে নি। গত শতকের শেষদিকে দক্ষিণ কোরিয়া মুখ থুবড়ে পড়ে। দাইয়ু মোটরস দেউলিয়া হয়ে যায়, সম্প্রতি দাইয়ু ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি কিনতে চলেছে ভারতের মালটিন্যাশনাল ভিডিওকন। সাম্প্রতিক আইএলও রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ কোরিয়ায় বেকার গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৩ হাজার। এরপর থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অগ্রগতিকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ প্রেসক্রিপশনের সাফল্য হিসাবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের ফতোয়া ছিল বিদেশী পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে হবে। তার পরিণতি কী হয়েছে? বিপুল বিদেশী পুঁজি বছর বছর ওসব দেশের বাজারে ঢুকতে থাকে। ব্যাংক, শেয়ার বাজার এবং রিয়াল এস্টেট ব্যবসায় ফাটকা পুঁজি ঢুকে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়িয়ে দেয় এবং স্থানীয় মুদ্রা ও ডলারের বিনিময় মূল্যকে অস্থির করে তোলে। এই অস্থিরতাকে পুঁজি করে মুদ্রার বাজারে ফটকা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকার সুযোগে বিদেশী পুঁজি তুলে নেওয়া শুরু হয় এবং এসব দেশের অর্থনীতি ধসে পড়ে। সাম্প্রতিক আইএলও রিপোর্ট অনুযায়ী গত দশ বছরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেড়েছে ৮৫ শতাংশ। ধীরে ধীরে উন্নয়নের নজিরের তালিকা থেকে এদেশগুলি বাদ পড়েছে। আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলকেও একসময় নয়া ক্লাসিক্যাল উন্নয়নের মডেল হিসাবে দেখান হত। কিন্তু এখন আর হয় না। আর্জেন্টিনায় সংকটের জেরে প্রবল গণবিক্ষোভ ঘটেছে এবং সরকার বদলেছে। একই অবস্থা মেক্সিকোর। নাফটা জোটে যোগ দেওয়ায় মেক্সিকোর জিডিপি বছরে ৩.৬ শতাংশ হারে বাড়তে থাকে। পাল্লা দিয়ে বাড়ে আয়ের বৈষম্য ও দারিদ্র্য; যাদের কাজ আছে তাদের মজুরি বাড়েনি।

ইদানিংকালে ভারতের অগ্রগতিকেও নজির হিসাবে দেখানো হচ্ছে। জিডিপি বৃদ্ধির হারে ভারত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির অন্যতম। কিন্তু মনে রাখা দরকার, একচেটিয়া গোষ্ঠীর শক্তির দিক থেকে ভারত অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক অগ্রসর। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুর্বল দেশগুলির সঙ্গে ভারতের তুলনা চলে না। ভারতের ওএনজিসি, রিলায়েন্স আইটিসি, ভিডিওকন র‍্যানব্যাক্সি, ডঃ রেড্ডিজ্ প্রভৃতি সংস্থা ভারতীয় মালটিন্যাশনালে পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যেই ভারতীয় পুঁজিবাদ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ছোট শরীক হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। আজ ভারতীয় পুঁজি বিদেশে খাটছে শুধু নয়, ২০০৬ সালের প্রথম নয় মাসে ভারতে যতটা বিদেশী পুঁজি এসেছে, ভারত থেকে পুঁজি রপ্তানি হয়েছে তার থেকে বেশি। প্রতিবেশী দেশগুলির বাজার ভারতীয় পণ্যে ছেয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সস্তায় কেনার জন্য টাটা কোম্পানি ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে ভারতের বুর্জোয়া সরকার দেশের সামরিক শক্তিকে বিশ্বমানে টেনে তুলেছে। বিশ্বের পয়লা নম্বর সন্ত্রাসবাদী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তারা হাত মিলিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট ভারতের শাসকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক বৃহৎশক্তি হিসাবে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে। ভারতে মেকি বামপন্থিরা নানা যুক্তির আড়ালে, দেশের স্বার্থের ধুয়া তুলে কেন্দ্রের শাসকদের সাথে হাত মেলালেও, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণ, বেকার শ্রমিক, যুবক, শিক্ষাবঞ্চিত ছাত্র, চাষী সকলেই লড়াই চাইছে। প্রকৃত মার্কসবাদীরা সে দেশে একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে লড়ছে।

আমাদের দেশেও বামপন্থি শক্তিসমূহ ভারত-মার্কিনসহ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তুলেছে। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল গত বছর ২৬ আগস্ট ফুলবাড়ী গণঅভ্যুত্থান। এ গণঅভ্যুত্থানের কারণে ফুলবাড়ী কয়লা খনি থেকে ব্রিটিশ বহুজাতিক কোম্পানি এশিয়া এনার্জি লেজ গোটাতে বাধ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, বামপন্থিদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে ইতোপূর্বে ভারতে গ্যাস রপ্তানির চক্রান্ত বানচাল হয়েছে, মার্কিন কোম্পানি এসএসএ-র কাছে চট্টগ্রাম বন্দর লিজ প্রদান ও এদেশে টাটার 'লোভনীয়' বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে। এ লড়াই এখনও অব্যাহত আছে।

কেবল বাংলাদেশে বা ভারতেই নয়, দুনিয়ার সর্বত্র সাধারণ মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছে। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিধর দেশের বিরুদ্ধে ইরাকি জনগণের স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছে। এর পাশাপাশি ফিলিস্তিনি জনগণের প্রায় ৬০ বছর ধরে চলা মুক্তিসংগ্রাম, মার্কিন হুমকির মুখে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কিউবার দৃঢ় অবস্থান, মার্কিন সামরিক হুমকি উপেক্ষা করে উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে প্রেরণা জুগিয়েছে। এমনকি খোদ আমেরিকার মাটিতে বসে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারের মতো সংগঠন আন্তর্জাতিক গণআদালত বসিয়ে তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে জর্জ বুশকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের রাজপথে বিক্ষোভ ঐতিহাসিক রূপ নিয়েছে, যার সঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের বিক্ষোভ তুলনীয়। ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়ার সরকারগুলি মার্কিন আধিপত্য এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রভাব এড়িয়ে বাঁচার 'বিকল্প' রাস্তা খুঁজছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোটা লাতিন আমেরিকাকে শোষণ করে রক্তহীন করে ফেলেছে – তেল, প্রাকৃতিক ও কৃষি সম্পদে ভরা লাতিন আমেরিকা থেকে সস্তায় কাঁচামাল নিয়ে যাচ্ছে মার্কিন কর্পোরেট সংস্থা এবং চড়া দামে উৎপাদিত পণ্য কিনতে হচ্ছে লাতিন আমেরিকান দেশগুলিকে। বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশক লাতিন আমেরিকার মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, গুয়াতেমালা, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশে বিদেশী পুঁজি ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের জাতীয়করণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপে তা বানচাল হয়ে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নে সংশোধনবাদীরা ক্ষমতা দখল করে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘাত এড়াবার নীতি নেওয়ার বাতাবরণে ষষ্ঠ দশক ও সপ্তম দশকে প্রধানত মার্কিন চক্রান্তে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বা অন্যভাবে জাতীয়তাবাদী শাসন ভেঙে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অনুকূল শাসকদের ক্ষমতায় আনা হয় এবং ক্রমে ক্রমে এসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিদেশী ঋণের সুদ, বিদেশী পুঁজির লভ্যাংশ, রয়ালিটি লাইসেন্স ফি ইত্যাদি রূপে কোটি কোটি ডলার সাম্রাজ্যবাদীরা লুট করতে থাকে লাতিন আমেরিকা থেকে।

পাশাপাশি লাতিন আমেরিকার নিষ্পেষিত জনতা দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং নিজ নিজ দেশের দক্ষিণপন্থি শাসকদের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ বলিভিয়ায় ইভো মোরালেস এবং ভেনিজুয়েলায় হুগো শ্যাভেজকে নির্বাচিত করেছে। এইসব রাষ্ট্রনেতারা জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন তথা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রধানত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভূমিবণ্টন, দেশের সম্পদের জাতীয়করণ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃপ্রতিম সহমর্মী সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আইএমএফ নির্দেশিত বিশ্বায়ন ফর্মুলার বাইরে গিয়ে তাঁদের ভাষায় – 'একটা বিকল্প খোঁজার চেষ্টা' এসব দেশে চলছে। যদিও বিপুল বিদেশী ঋণ এসব দেশের ওপর চেপে আছে, এবং এইসব সরকার সেগুলি অস্বীকারও করেনি। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপচেষ্টার অন্ত নেই। ভেনিজুয়েলায় মার্কিন উস্কানিতে তেলখনি অচল করা হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা হুগো শ্যাভেজকে ক্ষমতাচ্যুত করার মার্কিন চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। সমগ্র লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের চোখের মণি ফিদেলকে গুপ্তহত্যা করার জন্য দুশো বারেরও বেশি মার্কিন চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, ফিদেলের ভাষায়, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর অপেক্ষা করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৬, জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষী প্রতিস্পর্ধী বক্তৃতায় হুগো শ্যাভেজ বিশ্বের দুর্বল দেশগুলির কাছে আবেদন রেখেছিলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মনোনীত প্রার্থী গুয়েতেমালার বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে ভেনিজুয়েলাকে নিরাপত্তা পরিষদে পাঠাতে। তাঁর ওই আবেদন মার্কিন চক্রান্তের মুখে সাফল্য না পেলেও, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের মাঝে ব্যাপক শিহরণ জাগিয়েছে। এছাড়াও তিনি ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়েকে নিয়ে গঠিত মারকোসুর জোটকে শক্তিশালী করা ও সাম্রাজ্যবাদী জোটের বিকল্প হিসাবে দাঁড় করানোর সাহসী ডাক দিয়েছেন। ভেনিজুয়েলাকে তিনি গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় নেতা সাইমন দি বলিভারের আদর্শে গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাইমন দি বলিভার স্বপ্ন দেখেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত লাতিন আমেরিকায় বিশ্বের বৃহত্তম অখণ্ড এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। বলিভারের প্রেরণা আজও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে জীবন্ত। হুগো শ্যাভেজের সংগঠনের নাম রাখা হয়েছে রেভলিউশনারি বলিভারিয়ান মুভমেন্ট। ভেনিজুয়েলার নামকরণ করা হয়েছে বলিভারিয়ান রিপাবলিক। পাশাপাশি বলিভিয়ার জনগণের সংগঠিত বামপন্থি শক্তির নাম মুভমেন্ট টুওয়ার্ডস সোস্যালিজম। আবার সমস্ত লাতিন আমেরিকার স্বীকৃত নেতা সমাজতান্ত্রিক কিউবা ও ফিদেল। কাজেই একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যারাই লড়ছে তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। আমেরিকার সিয়াটলে, ইতালির জেনোয়ায় ইউরোপীয় বামপন্থিদের বিশ্বায়নবিরোধী লড়াইতেও 'পুঁজিবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি শোনা গিয়েছে।

এদিকে এ অবস্থার মাঝেই আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট রূপ নিচ্ছে। এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তার সাথে বিভিন্ন ইস্যুতে কখনও রাশিয়া-চীন, কখনও ফ্রান্স-জার্মানি আবার কখনও এ চারটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত

(ইরাক ইস্যুতে) দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের ঘটনা ঘটছে। ব্রিটেন ইরাক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ নিলেও তার জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মার্কিনবিরোধী মনোভাবের চাপে অন্যান্য ইস্যুতে তাকে কিছুটা নমনীয় ভূমিকা রাখতে দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্স-জার্মানি বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সংগঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। তারা এমনকি ন্যাটোর বাইরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী গঠনেরও চেষ্টা চালাচ্ছে। একথা এখন সর্বজনবিদিত যে বিশ্ববাণিজ্যে আধিপত্যের প্রশ্নে মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বন্দ্বের কারণেই বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও প্রায়-অচল-দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া, সুদান, শাদ, আইভরিকোস্টসহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে – একসময় যে দেশগুলো ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল – তথাকথিত শান্তিরক্ষার নামে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নেও ওদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে আছে। ওদিকে রাশিয়া-চীনও ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া ইস্যুসহ বিভিন্ন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অব্যাহত মতবিরোধের প্রেক্ষাপটে নিজেদের মধ্যকার ঐক্যকে ক্রমশ জোরালো করছে। তারা ইতোমধ্যে উজবেকিস্তানসহ মধ্যএশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশকে যুক্ত করে সাংহাই কোঅপারেশন নামে একটা সংস্থা গড়ে তুলেছে। এই দুটো দেশ ভেনিজুয়েলাসহ লাতিন আমেরিকার মার্কিনবিরোধী দেশগুলোকেও তাদের সাথে ভিড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছে। গত বছর হুগো শ্যাভেজের চীন সফরের মধ্যদিয়ে এক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতিও ঘটেছে। ফলে সব মিলিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখন বেশ বেকায়দায় বলেই মনে হচ্ছে।

আজকে পুঁজিবাদ শুধু অর্থনৈতিক সংকটেই পড়েনি। পুঁজিবাদের সংকট যেমন যেমন বেড়েছে, দেশে দেশে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ যেমন যেমন তীব্র হয়েছে, তেমন তেমন পুঁজিবাদ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার হিংস্র দাঁত নখ বের করেছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে যে পুঁজিবাদ ব্যক্তির অধিকার, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিল – একচেটিয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর পুঁজিবাদ সেই ঐতিহ্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে একে একে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, ক্রমাগত পুলিশ-মিলিটারির ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, প্রশাসনকে পুঁজির স্বার্থে নগ্নভাবে ব্যবহার ও পরদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ করতে শুরু করে। এভাবেই একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। সামন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানবসভ্যতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সময় পুঁজিবাদ যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুক্তিবাদ ও সাম্যের কথা বলেছিল, ফ্যাসিবাদ ঠিক তার বিপরীত। ফ্যাসিবাদ হল বিজ্ঞানের কারিগরি দিক ও আধ্যাত্মবাদী তমসাচ্ছন্ন চিন্তার বিচিত্র সংমিশ্রণ, ফ্যাসিবাদ হল সর্বহারা বিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে সামগ্রিক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান – মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি, লেনিন-স্ট্যালিন-মাওসেতুঙের শিক্ষার ধারাবাহিকতায় এসত্য তুলে ধরেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি আরও দেখান – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের সামরিক শক্তির পরাজয় ঘটলেও ফ্যাসিবাদের সামগ্রিক পরাজয় ঘটেনি বরং যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় বিশ্বপুঁজিবাদের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বিনষ্ট হওয়া এবং দেশে দেশে সর্বহারা বিপ্লবের বিজয় প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পটভূমিতে অগ্রসর অনগ্রসর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদ আজ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। তিনি আরও দেখান – কেবল সামরিক স্বৈরতন্ত্রই নয়, বাইরে সংসদীয় গণতন্ত্রের ঠাঁটবাট বজায় রেখে, দ্বিদলীয় এমনকী বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার আড়ালে ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া দুনিয়ার সমস্ত দেশের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে পরিচিত ইংল্যান্ডে শুধু 'সন্ত্রাসবাদী' সন্দেহে পুলিশ নিরীহ নাগরিককে হত্যা করছে কোনো বিচার ও শাস্তি ছাড়াই। সম্প্রতি সেখানে সন্ত্রাসদমনের নামে জনগণের প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে একটা কালো আইন তৈরি করা হয়েছে। মার্কিন সরকার গুয়ানতানামো বা আবু ঘ্রাইব কারাগারে ফ্যাসিবাদী বর্বরতার নজির রেখেছে শুধু নয়, নিজ দেশেও গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমাগত খর্ব করছে। দেশের সমস্ত নাগরিকের ওপর গোপন রাষ্ট্রীয় নজরদারির দ্বারা মার্কিন সরকার মার্কিন নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে খর্ব করেছে। সেখানেও সন্ত্রাসদমনের কথা বলে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এ্যাক্ট নামে এক কালো আইন বানানো হয়েছে। সিয়াটল-সহ বড় বড় মার্কিন শহরে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদী জনতার ওপর মার্কিন পুলিশ হামলা চালাচ্ছে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে একচেটিয়া প্রচারমাধ্যম। মার্কিন জনগণের সংগ্রামী সংস্কৃতিকে আড়াল করে মার্কিন সংস্কৃতির নামে নোংরা সাম্রাজ্যবাদী ইয়াংকি কালচার, যৌনতা, মাদকাশক্তি ও বেপরোয়া দায়িত্বহীন জীবনযাত্রার আকর্ষণীয় প্রচার চালাচ্ছে এবং দুনিয়াজোড়া তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে জনগণের সংগ্রামী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনবিমুখ নোংরামির ছাঁচে দুনিয়াকে ঢেলে সাজাতে চাইছে। বিশ্বায়ন এই পঙ্কস্রোতের বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করছে।

'সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' বইতে লেনিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের দিকনির্দেশ করে বলেছিলেন – সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ থেকে পৃথক কোনো ব্যবস্থা নয়। একচেটিয়া পুঁজিই সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি, যা পুঁজিবাদেরই অনিবার্য ফল। কাজেই নিছক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের কথা বলা অর্থহীন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃতই যাঁরা লড়তে চান তাঁদের নিজ নিজ দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তুলতে হবে এবং দেশে বিদেশে সর্বত্র পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে না থেকে যারা কেবল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলে – দেশে দেশে অভিজ্ঞতা হল – তারা শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বচনের আড়ালে জাতীয় পুঁজি এমনকী জাতীয় একচেটিয়া পুঁজির সমর্থনে দাঁড়ায়। এমন ঘটনাই ঘটেছিল, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সময়ে। কাউটস্কি প্রমুখ নেতারা সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদলের তত্ত্ব হাজির করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে তাঁরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে দাঁড়ালে লেনিন তাঁদের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির তীব্র সমালোচনা করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেন। প্রথম আন্তর্জাতিক মার্কস-এঙ্গেলসই ভেঙে দিয়েছিলেন বাকুনিন ও ব্ল্যাঙ্কিপন্থিদের নৈরাজ্যবাদী বিচ্যুতির বিরোধিতায়।

পৃথিবীর সকল সমাজবিপ্লবীকেই কঠিন হতাশাময় পর্ব পার হতে হয়। বিপ্লবের বিজয়ের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় না। মার্কসবাদের আবির্ভাবের আগে, বিপ্লবীরা অদম্য মনোবল এবং জনগণের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার জোরে হতাশা কাটিয়েছেন; মার্কসবাদ যেহেতু সমাজবিপ্লবের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব তুলে ধরেছে, তাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে মার্কবাদী বিপ্লবীরা আপাতদৃষ্টিতে চরম হতাশাময় পরিস্থিতিতেও ভবিষ্যতের অনিবার্য সাফল্যকে বুঝতে পারে, ধরতে পারে। পরিস্থিতির প্রতিকূলতার দোহাই মার্কসবাদী বিপ্লবীরা দেয় না। তারা সচেতনভাবে পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করার নিরলস চেষ্টা করে। রাশিয়ায় স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদীদের দ্বারা নেতৃত্ব দখল এবং প্রতিবিপ্লবের আঘাতে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙন; মাও সেতুঙের মৃত্যুর পর প্রতিবিপ্লবী তেং শিয়াও পিং চক্রের দ্বারা চীনের সমাজতন্ত্র ভেঙে পুঁজিবাদ ফেরানোর ঘটনা এবং সেই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়নী নয়া-ঔপনিবেশিক আক্রমণ, সংশোধনবাদী ও প্রতিবিপ্লবীদের হাতে মার্কসবাদের মহত্ত্ব খর্বিত হওয়ার ফলে মেহনতি মানুষের আদর্শগত বিভ্রান্তি বর্তমানে একটা সাময়িক নিস্তেজনা সৃষ্টি করেছে এটা ঠিক কিন্তু এর ফলে প্রকৃত মার্কসবাদীরা হতাশ হয় না বরং সংকল্পে আরও অটল হয়ে তারা বিপ্লবের সাধনায় নিজেকে বিলীন করার চেষ্টা করে।

শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজপরিবর্তনের যে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা মার্কসবাদ দিয়েছে তার আলোকে বিচার করলে বোঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র বিকল্প হল সমাজতন্ত্র যা গড়ে ওঠে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে। দুনিয়াজোড়া যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম চলছে তাকে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে এবং এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনতা পথে নেমেছে তাকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনায় নিষিক্ত করতে পারলে জন্ম নেবে এক অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী জনশক্তি, যা সাম্রাজ্যবাদের কবর রচনা করবে। পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকরা বলছেন – সামজতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে, অথচ পুঁজিবাদ নাকি রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো চিতাভস্ম থেকে আবার বেঁচে ওঠে। এর উপযুক্ত জবাব মেকি মার্কসবাদীরা দিতে পারে না। নিষ্ঠাবান সৎ মার্কসবাদীরাও বিভ্রান্ত। সেই মুহূর্তে আমাদের সামনে দাঁড়ান মহান স্ট্যালিন, লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে তিনি বলেন – "Some comrades think that, once there is a revolutionary crisis, the bourgeoisie must be in a hopeless position; that its end is therefore predetermined, that the victory of the revolution is thus assured, and that all they have to do is to wait for the fall of the bourgeoisie and to draw up victorious resolutions. This is a profound mistake. The victory of the revolution never comes by itself. It must be prepared for and won. And only a strong proletarian revolutionary party can prepare for and win victory. Moments occur when the situation is revolutionary, when the rule of the bourgeoisie is shaken to its very foundations, and yet the victory of the revolution does not come. because there is no revolutionary party of the proletariat sufficiently strong and influential to lead the masses and to take power." (Report to the 17th Congress of CPSU) (কিছু কমরেড মনে করেন যে একবার একটা বিপ্লবী সংকট তৈরি হলে বুর্জোয়াশ্রেণী অবশ্যই হতাশাজনক পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে। বুর্জোয়াদের পরাজয় যেহেতু পূর্বনির্ধারিত, অতএব বিপ্লবের বিজয় সুনিশ্চিত। কাজেই তাদের কাজ হল বুর্জোয়াদের পতনের জন্য অপেক্ষা করা, আর বিজয়ের পক্ষে নানা প্রস্তাব গ্রহণ

করা। এটা একটা সাংঘাতিক ভুল। বিপ্লবের বিজয় কখনোই আপনা আপনি আসে না। এর জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি লাগে এবং তা জিতে নিতে হয়। এবং একটা শক্তিশালী সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দলই কেবল এ-বিজয় অর্জন করতে পারে। এমনও সময় আসে যখন পরিস্থিতি বিপ্লবের অনুকূল হয়ে ওঠে এবং বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে ওঠে। কিন্তু তার পরও বিপ্লবের বিজয় ঘটে না। এর কারণ হল তখনও পর্যন্ত জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার ও ক্ষমতাগ্রহণের জন্য যথেষ্ঠ শক্তিশালী ও প্রভাবশালী একটা সর্বহারা বিপ্লবী দলের অনুপস্থিতি।)

এই শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে মুক্তিপথের সন্ধান। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বর্তমান সংগ্রাম আগামী দিনের বিপ্লবী সংগ্রামের সূচনা। এই সংগ্রামকে বর্তমান স্তর থেকে আরও উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের দলের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হল :-

১। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলোর মাঝে একদিকে নিজ নিজ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং অন্যদিকে অব্যাহত মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে সামগ্রীক মতাদর্শিক ঐক্য গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি। এই প্রক্রিয়ায় অতীতের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে একটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠনের পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। সেই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এ ধরনের কিছু উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ওই উদ্যোগসমূহকে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে সমন্বিত ও কেন্দ্রীভূত করা জরুরি।

২। বিশ্বের দেশে দেশে আজকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যেসব সংগ্রাম চলছে সেগুলো সমন্বয়ের স্বার্থে সব দেশের বিপ্লবী কমিউনিস্টদের চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের একটা কেন্দ্রীয় সমন্বিত পরিচালনা সংস্থা দরকার – যা বিশ্বপরিসরে, আঞ্চলিক ও জাতীয় আন্দোলনসমূহকে সমন্বিত ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়িত কথিত মুক্তবাজারের পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামকে সমন্বিত করে বিপ্লবী ধারায় এগিয়ে নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ও তার আঞ্চলিক শাখা গঠন করার কথা ভাবা যেতে পারে।

৪। দেশে দেশে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ বামপন্থি আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি এবং সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করে বিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

আসুন, আমরা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-বৈষম্য, যুদ্ধ আর অশান্তির বিশ্বায়নের অভিশাপ থেকে বিশ্বকে মুক্ত করি। দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পথে মুক্ত স্বাধীন সাম্যবাদী মানুষের নতুন দুনিয়া গড়ে তুলি।

"... দশ মুখো ঐ ধনিক রাবণ
দশ দিকে আছে মেলিয়া মুখ
বিশহাতে করে লুণ্ঠন তবু
ভরে না'ক ওর ক্ষুধিত বুক।
গ্রাসিল বিশ্ব লোভ-দানব
হাহা স্বরে কাঁদিতেছে মানব। ..."

নজরুল